অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 87-95
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.012

'BABARER PRARTHANA' - SASWATA PITRIHRIDAYER ABHIBAYKTI / 'বাবরের প্রার্থনা'-শাশ্বত পিতৃহৃদয়ের অভিব্যক্তি

RUPA KUNDU / রূপা কুণ্ডু
গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া
Email: kundurupa89@gmail.com

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords: পিতৃসত্তা, আর্তি, সংহত, আবেগ, আত্মমগ্ন, কবিতা, শাশ্বত, মেলবন্ধন, সামাজিক, ভাববৈচিত্র্য, সন্তানস্নেহ, প্রজন্ম, রক্ষার, তাগিদ, বাস্তবতা, জীবনবোধ।

Abstract: সময়ের জাগ্রত বিবেক রূপে প্রতিষ্ঠিত কবি শঙ্খ ঘোষ , তাঁর কাব্যে এক অভিশপ্ত সমাজের রূপ প্রকাশ পেয়েছে সময়ের দোলাচলমানতায়। পশ্চিমবঙ্গের সত্তরের দশকের এক বিরাট বিশ্বস্ত সময়ের দলিল এ কাব্য। সময়ের অভিঘাত, শাসকের উন্নত্ততা এবং সংবেদনশীল মানুষের প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছে। অসুস্থ এক প্রজন্মের আরোগ্য কামনায় ব্রতী হয়েছেন কবি। কবির মনে হয়, আমাদের মজ্জার মধ্য দিয়ে শাসকের পাক দেওয়া টান, যার শেষ নেই, শুরু নেই, চোখ নেই, স্নায়ু নেই, আছে শুধু পরাগ, আবর্ত ঘূর্ণি তাই নিপাত যেতে বলেন তিনি। প্রথা ভাঙতে চান তিনি, তবুও কোথাও যেন তিনি দ্বিধান্বিত ধ্বংস করতে হয় আমাদেরই আত্মাকে আপন হাতে। এটাই দুঃখের শহরের বুকে জেগে থাকে কবরের পর কবর। তারা যেন স্থির হয়ে নতজানু আর প্রার্থনায় হিম, পুরাতন সৃষ্টিতে ঘুণ ধরেছে যেন। পথের দুধারে প্রগতি ও উত্থান, শিকড়ের সন্ধান করে চোখ তবু অসফল তিনি রুদ্ধশ্বাসে বাঁচাতে চান সব। কিন্তু ব্যর্থ হন। জীবনের শেষ অপমান মুছে নিতেও চেয়েছেন কখনো ডানার নিস্তব্ধতা যেন বলে যায় দূরে যাওয়ার পথ নেই। সন্ততিহীন কবিসত্তা পথের বাঁকে একলা দণ্ডায়মান, ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিক্ষুব্ধ – সমস্যজর্জর পরিস্থিতিকে প্রকাশ করেছেন কবি।

বর্তমান সময়ের ভোগবাদ-হিংস্রতা-স্থবিরতার চিত্রকে উপস্থাপিত করের প্রচেষ্টা করেছেন। বাবর যেন চিরন্তন পিতৃসত্তার পরিচায়ক একজন পিতা তথা বিবেকবান সত্তা। তিনি আগামী প্রজন্মের আরোগ্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছেন। তিনি নিজের পাপের ভার সন্তানের ওপর দিতে চাননি। তাই, তার প্রার্থনা সমাজের সুস্থতার লক্ষ্যে – আরোগ্যের লক্ষ্যে। যুদ্ধ, হিংসা ও বিদ্বেষের প্রতি অনাস্থা ও ভালোবাসা, শান্তি এবং সৌন্দর্যপূর্ণ ভবিষ্যত গড়ার ব্রতী হয়েছেন কবি।

Discussion:

মরমি হওয়াই কবির প্রাথমিক শর্ত। ব্যক্তি শঙ্খ ঘোষের পারিবারিক ও সাংসারিক সত্তা ভীষণ ভাবে স্বাভাবিক সত্তা হয়ে দেখা দিয়েছে সব ক্ষেত্রেই। রবীন্দ্রবেত্তা শঙ্খ ঘোষের রবিপ্রেম পিতৃপ্রদত্ত এ কথা সর্বাগ্রে গণ্য। রবীন্দ্রনাথকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাঠ করেই তিনি রবীন্দ্রাশ্রিত হয়েছেন। স্থৈর্য্য তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ ঠিক রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য। যেকোন পরিস্থিতিতে অবিচল, অনুত্তেজিত থাকা এ এক বিরল বৈশিষ্ট্য। কবিকে ছুঁয়ে রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করা যাবে অনেকখানি। বড়ো বেশি কথার ক্লান্তি থেকে দূরে স্থায়ীত্ব খোঁজে তাঁর কবিতা। নিরর্থক প্রকাশ্যতা বিজ্ঞপ্তি জীবন তাঁর কাম্য ছিল না। তাই কবি আড়াল চান। বয়সোচিত খ্যাতির লোভ, মঞ্চ সফলতা থেকে তিনি কেবলই দৃষ্টি এড়ীয়ে চলতে চেয়েও ব্যর্থ কারন তাঁর পক্ষে ছন্দ ভোলা কঠিন হয়ে পড়ে। তাঁর অবিনাশী মেধা-মননশীলতা-অফুরাণ প্রতিভা তাঁকে লিখতে বাধ্য করায়। শৃঙ্খলা চিরদিন থেকেছে জীবনে ও শিল্পে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁর রচনায় যেভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হই মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথ হয়তো নিজে এসে তাঁর কলমে এইসব বিশ্লেষণ উপলব্ধি লিখে গিয়েছেন। শঙ্খ ঘোষের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিনগুলি রাতগুলি'-তে প্রতিফলিত হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তি কবির প্রতিবাদী অভিজ্ঞান। এ কাব্যের 'দিনগুলি রাতগুলি', 'অবগুণ্ঠিতা' কবিতার মতো সংহত আবেগের আত্মমগ্ন কবিতা যেমন ঠাঁই পেয়েছে তেমনই 'যমুনাবতী' ও 'শিশুসূর্য' নামের কবিতাও এসেছে স্বাভাবিকতার প্রকাশে। এই কবিতার উৎস কোচবিহারে খাদ্য আন্দোলনের মিছিলে পুলিশের গুলি চালনার এবং কিশোরী হত্যার প্রতিবাদ-

"নিভন্ত এই চুল্লি তবে
একটু আগুন দে।
হাতের শিরায় শিখার মাতন
মরার আনন্দে!" [১]

বাস্তবিকই এই কবিতা ছিল বাংলা কবিতার আঙিনায় প্রতিবাদের শ্রেষ্ঠ সংযোজন। প্রান্তিক মানুষের বুভুক্ষার যন্ত্রণা, শোষকদের নিষ্ঠুর ভূমিকা কবির হৃদয় তন্ত্রীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ভাতের বদলে গরম সিসার বুলেট যখন কিশোরীর জীবনের অধিকারকে ছিনিয়ে নেয়, তখন কবির অন্তঃশীল প্রতিবাদী সত্তাটি বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। একইরকম ভাবে সদ্য স্বাধীন দেশের সরকার যখন জনগণের ন্যূনতম চাহিদা পূরণে ব্যর্থ – দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের যোগানে অক্ষম – যখন হাহাকার আর মৃত্যু শোকে কালো হয়ে উঠেছিল দেশের আকাশ কবির সংবেদন মনে প্রতিবাদী সত্তাটিও জেগে উঠেছিল। তাঁর 'শিশুসূর্য' কবিতায় সেই উচ্চারণ আরো তীব্র হয় -

"এ কোন্ দেশ?
তোমার শরীর শিশু মৃত্তিকায় লগ্ন ক'রে ক'রে
শৈশব কামনা করে দেশমাতা দেশ

এ কোন্ দেশ
অসংখ্য শিবিরে রুদ্ধ শিবির কামনা করে
এ কোন্ দেশ?" [২]

প্রতিবাদের রূপ ক্রমশ তীব্রতার সাথে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্যান্য পরের কাব্যগুলিতে। 'মূর্খ বড়ো সামাজিক নয়', কাব্য থেকেই সেই চেতনা সংহত রূপ পেতে শুরু করে। 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যে এসে তা তুঙ্গস্পর্শী হয়। কবি শঙ্খ ঘোষ নিছকই যে একজন কবি তা কিন্তু নন। সময়ের জাগ্রত বিবেক তিনিই। কবিতার কাজ যে সত্যকে উদ্ঘাটন করা তা তিনি জানতেন। সে সত্য ব্যক্তিক-সামাজিক উভয়ই হতে পারে। যোগ্য ভাষাই পারে সত্যের নগ্নতাকে প্রকাশ করতে। আধুনিক মননশীল কবি বলেই তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যর মেল-বন্ধনে খুঁজে পেয়েছেন নিজ সংস্কৃতির মূলকে। চেতন-অবচেতনের যাবতীয় কাজকে বাস্তবতার মাত্রায় চিহ্নিত করেছেন তাঁর কাব্যে। ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয় 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যটি। ১৯৭৪-৭৬ সময়কালেই এ কাব্যের কবিতাগুলি রচিত। সময়টি এক অভিশপ্ত সময় যেন গোটা সমাজের কাছেই চতুর্দিকে নকশালপন্থী কার্যকলাপ, নেমেছে জরুরি অবস্থার তরবারি, বিদ্বেষের আগুনে ক্রমশ ভস্মিভূত প্রায় গোটা দেশ। সংবাদপত্রের অধিকার যখন কেড়ে নেওয়া হয়েছে, ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে, যখন রাষ্ট্র তার বীভৎস রূপ নিয়ে গ্রাস করতে উদ্যত গণতান্ত্রিক কাঠামো। তখন নিরুপায় কবন্ধ সময় তার সমস্ত আঘাত-প্রত্যাঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কালান্তরে ব্যাপ্ত করে। তখনই রচিত হয় কবির কলমে প্রতিবাদের অমোঘ অস্ত্রস্বরূপ কাব্য 'বাবরের প্রার্থনা'। যে কাব্যের তিনটী উপশিরোনামে রয়েছে – 'মণিকর্ণিকা' (১৫টি কবিতা), 'খড়' (১৪টি কবিতা) এবং 'হাতেমতাই' (১৮টি কবিতা) কবিতা।

কবির লেখা এ কাব্যটি পশ্চিমবঙ্গের সত্তরের দশকের এক বিরাট বিশ্বস্ত সময়ের দলিল। এ কাব্যের কবিতা জুড়ে কেবল সময়ের অভিঘাত, শাসকের উন্মত্ততা এবং সংবেদনশীল মানুষের প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছে। বইটি জনপ্রিয়তার কারণে বহুবার মুদ্রিত হয়েছে। নামকবিতা 'বাবরের প্রার্থনা' অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে। আবার যেমন নিজের আয়ুর বিনিময়ে অসুস্থ সন্তান হুমায়ুনের আরোগ্য প্রার্থনা করেছেন কবিও তেমন কাব্যের প্রায় সমস্ত কবিতা জুড়ে অসুস্থ প্রজন্মের আরোগ্য কামনা করেছেন। প্রথম কবিতা 'ধ্বংস করো ধ্বজা'-তে কবি বলেন –

"আমি বলতে চাই, নিপাত যাও
এখনই
বলতে চাই চুপ
তবু
বলতে পারি না। আর তাই
নিজেকে ছিঁড়ে ফেলি দিনের পর দিন।" [৩]

কবির মনে হয় আমাদের মজ্জার মধ্য দিয়ে শাসকের পাক দেওয়া টান, যার শেষ নেই, শুরু নেই, চোখ নেই, স্নায়ু নেই আছে শুধু পরাগ, আবর্তন, ঘূর্ণি তাই নিপাত যেতে বলেন তিনি। প্রথা ভাঙতে চান তিনি তবুও কোথাও যেন তিনি দ্বিধান্বিত, ধ্বংস করতে হয় আমাদেরই আত্মাকে আপন হাতে, এটাই দুঃখের। শহরের বুকে জেগে থাকে কবরের পর কবর। তারা যেন স্থির হয়ে নতজানু আর প্রার্থনায় হিম। পুরাতন সৃষ্টিতে ঘুণ ধরেছে যেন, পথের দুধারে প্রণতি ও উত্থান। শিকড়ের সন্ধান করে চোখ তবু অসফল তিনি রুদ্ধশ্বাসে বাঁচাতে চান সব। কিন্তু ব্যর্থ হন। জীবনের শেষ অপমান মুছে নিতেও চেয়েছেন কখনো। ডানার নিস্তব্ধতা যেন বলে যায় দূরে যাওয়ার পথ নেই। সন্ততিহীন কবিসত্তা পথের বাঁকে একলা দণ্ডায়মান। দশকের পর দশক সমাপ্ত হয় তবু কথা বলা বারণ। গঙ্গাবক্ষে চলাচলের রেখা-ধ্বনি সবই মিলিয়ে যায়। চিরকাল পথ জেগে থাকে আগামীর অপেক্ষায়। রাশি রাশি নামহীন কবর দেখে কবি দুঃখ বোধ করেন। অপরাধময় গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়েছে নিজস্বতা তবু প্রার্থনাও হয়ে

ওঠে শাদা ফলকের অভিমান। সর্বত্রই যেন ভয়াবহ আরতির চিত্র। কবিতাগুলির আবেদন কবিতারই আবেদন, সময়ের উষ্ণতার আলাদা কোন সমর্থনের প্রয়োজন নেই। এইসব কবিতা সময়কে অতিক্রম করেই এগিয়ে চলে। এই 'মণিকর্ণিকা' উপশিরোনামের কবিতাগুলি যেন আত্ম জাগরণের কবিতা, কবি যেন নিজের সাথেই নিজেকে চেতনা দিতে ব্যস্ত। প্রতিবাদের ধরনটি বেশ মনোগ্রাহী এবং মৌলিক। কবির এই 'আমি'-'তুমি' যেন তাঁর নিজেরই সত্তা বলা ভালো আমারই অচ্ছেদ্য 'দ্বিতীয় আমি'। 'ধ্বজা' শব্দটি রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটক থেকেই বিশেষ অর্থবাহী হয়েছে আমাদের কাছে, সেখানে ধ্বজাপুজো হয়, সে পুজোয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে রাজা আসতে চেয়ে ভেঙে চুরমার করেন অনেককিছু যা সম্মুখে পান। আসলে এই পুজো প্রভুত্বের পুজো। তাই পরিবর্তিত রাজার প্রথম লড়াইয়ের সূচনা হয় ধ্বজার বিরুদ্ধে, প্রথমে এই ধ্বজাকে তিনি ভাঙেন তারপর ক্ষমতার বিরুদ্ধে গিয়ে মানুষের ঐক্যরক্ষার মিছিলে যোগদান করেন। লড়াই তখনও জারি থাকে। আমাদের মনেও এরকমই একটি ধ্বজা থাকে যা আমরাই বয়ে নিয়ে যাই। যা আমাদেরই ক্ষমতাদর্পী প্রভুত্বের নিশানা। কবিতায় ধ্বজা ধ্বংসের কথায় আমরা যেন আমাদের মনের শাসক মনকে ধ্বংস করি। এই 'তুমি' আসলে আমাদের ক্ষমতাদর্পী সত্ত্বা ধ্বজা। আমাদের যক্ষপুরীর রাজা, আমাদের অন্য 'আমি', এই আমিকে সর্বতোভাবে আমাদের ভাঙতে বলেন কবি। কিন্তু ভাঙতে অক্ষম আমরা। 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরীর মকররাজের কথা চোখে পড়ে ধ্বজা এবং আত্মার খুব কাছাকাছি সমাবেশ। অন্ধ ক্ষমতার মত্ততা আমরা কম-বেশি সকলেই বহন করি। বর্জন করতে সক্ষম হই না, সে পারঙ্গম ক্ষমতা সবার নেই। তখন অপেক্ষা আর এক 'তুমি'র যার এরক্স নাম দেওয়া যেতেই পারে মৃত্যু বা আত্মশুদ্ধির প্রকাশ। মনে রাখতে হবে এই 'মণিকর্ণিকা' আসলে কী ? কাশী নগরীর গঙ্গা তীরবর্তী এক শ্মশান ঘাট, যা চিরপ্রজ্জ্বলিত। মৃত্যু এখানে শুদ্ধতার প্রতীক হয়ে দেখা দেয়। মৃত্যুর জলযানে অপূর্ব নৌকাবিহার, যেন আমাদের পাঁজরের মধ্যে ডুব দিয়ে যায় শুশুক। কবি বলেন –

"এবার আমরা ঘুরিয়ে নেব নৌকা
দক্ষিণে ওই হরিশ্চন্দের ঘাট
দুদিকেই দেখা যেয় কালুডোমের ঘর
চতুর্দশীর অন্ধকারে বয়ে যায় গঙ্গা
এক শ্মশান থেকে আরেক শ্মশানের মাঝখানে
আমরা কেউ কারো মুখের দিকে তাকাই না।" [৪]

কবির হৃদয়ে আর কোন অনুমোদনের অপেক্ষা নেই। তিনি ঋদ্ধ, জানেন ভুলের মাত্রা, ধ্বংসের সূচি, হাত দিয়ে স্পর্শ করলে ভস্ম হয়ে যাবে মুখ। সভ্যতা যেন পাঁজর চেপে দণ্ডায়মান লোল রসনা নিয়ে। জীবন যেখানে বন্দীত্বে রয়েছে, সেখানে জেগে ওঠা দায়। 'তক্ষক' কবিতায় দেখব অপরূপ ছন্দ সুষমায় গ্রথিত শব্দ বুনন। 'তুমি'র পরিচয় প্রদান করেছেন কবি স্বনিয়মে, বোঝাতে চেয়েছেন 'তুমি' বন্ধুহীন সত্তা, বৃত্তিহীন সত্তা। ভিত্তিহীন, শীর্ষহীন, নৌকাহীন, বৈঠাহীন, উৎসহীন, ক্ষান্তিহীন সেই সত্তার আছে শুধু বন্ধন, ব্যাপ্তি, ছন্দ, জাগরণ, উত্থাপন, বিচ্ছুরণ উদ্ভিদের মতৈ, শক্তির মতোই তার মিথ্যা নেই, সত্য নেই দংশন আছে। 'তুমি' কেবল দৃষ্টিহীন, শ্রুতিহীন সত্তা যেন। 'তক্ষক' কবিতার আলম্বন-বিভাব পুরান কথার প্রতিভাসে সমকালীন বাস্তবতার সাথে পরিচয় করানোর চেষ্টা করে। ক্ষতচিহ্নগুলিকে ঢেকে চলার দুর্বার প্রচেষ্টা যেন। এখানে এই পদ অনেকটা আর্কেটাইপ-এর কাজ করেছে। মহাভারতের কূট চরিত্র 'তক্ষক', এক নাগবংশীয় রাজা। এই হত্যার প্রতিশোধের লক্ষ্যেই সর্পনিধন যজ্ঞের আয়োজন করেন রাজা জনমেজয়। সেক্ষেত্রে আমাদের সংস্কারে, নির্জ্ঞান ও সজ্ঞান চেতনায় তক্ষক অমঙ্গলেরই প্রতিভূ। কবি এই নামকে কবিতার কেন্দ্রে রেখে কবিতায় সম্ভাব্য অমঙ্গলকে পরিচিত করানোর বাসনা রেখেছেন। একালের ষড়যন্ত্রকারী ক্ষমতাতন্ত্রের প্রতীক যেন তক্ষক। প্রতিকূলতার কারণে আজ সেও নিঃসঙ্গ-নিরুপায়। তার

সেই অবলম্বনহীন অসহায়তাকে বিদ্রুপাত্মকভাবে চিহ্নিত করেন পংক্তি সাজিয়ে। বিরোধাভাস অলংকারের মাধ্যমে কবি গোটা কবিতাকে সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন। ক্ষমতার অস্তিত্ব যে কী ভয়ঙ্করতার প্রতিরূপ হতে পারে তা দেখিয়েছেন কবি। সমাজের ধ্বংসাবশেষের মাঝেও মহা নিমগাছ সনাতন ছায়া ফেলে। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সেই ভূখণ্ড যা অশীতিপর, অন্ধ-সন্ততিহীন দশকের প দশক শুধু সমর্পন রয়েছে তার। জীবনের প্রতি অনাস্থা নিয়েই আর্তি খোঁজে পথ। 'বাবরের প্রার্থনা'য় ধরা পড়ে নিবেদিত প্রাণের কথা। যদিও কেউ কারো মতো নয় কবি তবু প্রাণকে বলেন – নিঃশব্দ নিজেই আলো। সুপুরিবনের সারির দিকে কবি পথ অতিক্রমের চেষ্টা লক্ষ করা যায়। ব্যক্তির স্বর দেশকালের স্বর আর বিশ্বজাগতিক স্বর এক হয়ে যায় ইতিহাসের পাতায়। হুমায়ুনের প্রতি বাবরের আকুতি উত্তর প্রজন্মের প্রতি এই প্রজন্মের আর্তি-হাহাকার-কান্না যেন পিতার সংবেদন প্রার্থনার সেই কবিতার মহাকালের ধ্বনি এসে যেন মিলিত হয়েছে শাশ্বত সত্যের দাবীতে –

"এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত-
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।" [৫]

শূন্যতা শঙ্খ ঘোষের একমাত্র কাঙ্ক্ষিত সত্য নয়, বরং তিনি লক্ষ করেন তাঁর ভেতরকার ঢেউকে, দোলাচলমানতাকে। প্রেমের আশ্রয়ে দীর্ঘ চরাচরের চেয়ে আর কোনো পথ নেই। এমন আশাই কবির প্রার্থিত। কবির আকুতি তাঁরই হাতে এত সম্ভার, তবু সন্তানকে কেন জীর্ণতা বহন করতে হবে। এই কবির চিন্তা। এ কবিতার মিথ ভারতবর্ষের মধ্যযুগের কেন্দ্রীয় চরিত্র মোঘল সম্রাট বাবরের সাথে যুক্ত। কথিত আছে পুত্র হুমায়ুন ঘোরতর অসুস্থ হয়ে পড়লে বাবর নিজের প্রাণের বিনিময়ে ঈশ্বরের কাছে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চান। আশ্চর্য্যের বিষয় এটাই যে কিছুকাল পর পুত্র সুস্থ হলে পিতা অসুস্থ হন এবং মারা যান। ইতিহাসের এই সত্যকে কবি আর্কেটাইপ করে সমকালীন সমাজ রাজনীতিকে প্রতিস্থাপন করেছেন। W.B. Yeats-এর এক যুগান্তকারী সৃষ্টি – 'A Prayer for my Daughter' কবিতার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তবে ইতিহাস ও সমকালীনতার দিক থেকে তা ইয়েটসকেও অতিক্রম করেছে। নিজের সন্তানের জন্য উদ্বিগ্ন এক সাধারণ পিতা এই কবিতা পাঠে নিজেকে বাবরের জায়গায় বসাতে পারেন। অনুভব করতে পারেন হৃদয়ানুভূতি। এখানেই কবিতার সার্থকতা। তবে এর দশকে এই সত্য এক জাগ্রত সত্য। সমকালীন আন্দোলন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তারুণ্য ধ্বংস করেছিল। কবির দায়বোধ কোথাও গিয়ে গভীরতা স্পর্শ করতে পেরেছিল। নিজের প্রাণের বিনিময়েও তিনি সমাজের ক্ষয় রোগের বিনাশ চেয়েছিলেন। ব্যাধি দূর করতে চেয়েছিলেন, যৌবনশক্তির আরোগ্যে দেশের ভবিষ্যৎ রক্ষা পাবে এমনই আশা করেছিলেন কবি। সমকাল যেন সময়ের বিবেক রূপে তৈরি করেছে কবিকে – বিশ্বের মানব সত্তার ঐক্যশক্তির প্রতিভূ কবি। তাই তিনি আশাবাদী। স্বপ্ন দেখতে ভোলেন না। এ কাব্যের 'খড়' কবিতায় কবির মনে হয়েছে নীড়ের খড়-ই শুদ্ধ ভালোবাসার পরিচায়ক, যা অন্তরের ঐশ্বর্য্যে স্বর্ণময়ী যা মৃত্যুহীন। কখনো বা কবি তাঁর অন্তরাত্মার কথা বলেন – যা বন্দীত্বে বাঁচে। শহরের অ্যাসফল্টে তার বুক বাঁধা। এসবই কাল্পনিকতার ভাবনার সাথে বাস্তবের মেলবন্ধন। 'খড়', 'গাছ' প্রভৃতি রূপকল্পে কবি সমাজের ছবি, প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন। কবি শঙ্খ ঘোষের সমাজ চেতনামূলক কাব্যের ক্ষেত্রে ব্যাপকতর অনুভবই প্রধান রসদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতে জরুরি অবস্থার সময় তাঁর কবিতা যেন গর্জে ওঠে দুঃশাসনের বিরুদ্ধে। কবি সামাজিক পাহারাদারের ভূমিকায় নিজেকে জাগিয়ে রাখেন। 'ঠাকুরদা' শব্দটির প্রয়োগ কবি বহুবার বহু জায়গায় করেছেন। কবির কাজে ধর্ম কখনো বড়ো ভূমিকা নেয়নি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটি বড়ো অভিযোগ যে তিনি শুধু বিশ্বকবি নন ভারতবর্ষীয় কবিও। কিন্তু তাঁর লেখায় হিন্দু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা যেভাবে এসেছে সেরকম মুসলিম ঐতিহ্য বা কীর্তি আসেনি। অথচ ভারতের

দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান, এবং তার প্রজা ও কৃষকের সবাই ছিলেন মুসলিম শ্রেণীভুক্ত। এসবের উত্তর দিতেই তিনি তাঁর অমর 'শা-জাহান' কবিতাটি লিখেছিলেন। সেই কবিতার বহু পংক্তি প্রবাদে পরিণত হয় ক্রমে। যেমন –

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।" [৬]

কবি রবীন্দ্রনাথ 'শা-জাহান' কবিতায় তাকে 'ভারতঈশ্বর' অভিধায় ভূষিত করেছেন। তার কীর্তির চেয়ে তাকে মহান করে দেখেছেন। আধুনিক মহত্তম কবি শঙ্খ ঘোষ অন্তরের তাগিদ থেকেই 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যটি রচনা করেছেন। ভারতের ১৯৭৪ সালের কঠিন রাজনৈতিক ও নিরেট দুঃস্বপ্নের প্রেক্ষাপটকে রূপকের আড়ালে উপস্থাপনের জন্য। তাই শঙ্খ ঘোষের কবিতায় ভারতীয় সমন্বিত ঐতিহ্য ঠাঁই পেয়েছে এ কথা অনস্বীকার্য। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই মানুষ এই ধারনাই শ্রেষ্ঠ ধারণা। তাঁর কবিতার শক্তি হচ্ছে গনমুখী, নান্দনিকতার শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি। শব্দশৈলীর অন্তরালে আস্তব চিত্রকল্প কবির ভাবনার সত্যতা প্রকাশ করে অবিরত। পবিত্র সরকার মনে করেন – "রবীন্দ্রনাথের পরে, শঙ্খ ঘোষ এবং আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত নিয়মিতভাবে চেষ্টা করে গেছেন তাঁদের সাহিত্য সংক্রান্ত লেখালেখির মাধ্যমে নিজেদের ভাবনা জগতের মধ্যে একপ্রকার মিথস্ক্রিয়া নির্মাণের।"

রবীন্দ্রনাথ যেমন অভ্যাসের গণ্ডী পেরিয়ে গদ্যকবিতার পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তেমন শঙ্খ ঘোষও তার স্বাভাবিক নিয়মেই শব্দের আলোড়নকে সংহত করার জন্য গদ্য কবিতাকেই আশ্রয় করেন বেশি। রবীন্দ্রনাথের 'তুমি' এবং শঙ্খ ঘোষের 'আমি'র মিল ভীষণ রকম। কবি অবিরাম আলাপ চারিতায় সংশয় ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্বের ভেতরে সত্যের অনুসন্ধান করেন। নিজেকে নিজেই প্রশ্নকে কথা বলতে কবি ভালোবাসেন, তাই অনায়াসেই বলতে পারেন।

"মাঝে মাঝে মনে হয়। তুমিও কি
তুমি কি পাগল হয়ে যাবে?
কিন্তু তা সহজ নয়, কেননা এখনও
এই ঘোলাটে হলুদ সর্বনাশ..." [৭]

কবির প্রতিটি কবিতা জুড়ে কেবল বর্তমানের রূপ পরিগ্রহ করে চলার কথাই ধরা পড়ে। মনকে তৈরি করেন অনায়াসে। সমাজের ক্রিয়ার থেকে রসদ খোঁজেন বাঁচার। বিলীয়মান মাটিকে ফিরে পেতে চান। মুক্তি চান নিরন্তর পুরাণের চরিত্রকে নিয়ে সমকালের সংকটকে বোঝাতে চেয়ে তিনি 'ইন্দ্র ধরেছে কুলিশ' নামক কবিতা লিখেছেন। কী মানবিকতা সন্ধান, কবি সবসময় সুস্থ মানসিকতার বীজ বুনেছেন। মূলত মানুষ তাঁর কবিতার মুখ্য বিষয়। 'শান্তি' নামক কবিতা, 'ঘরে বাইরে' নামক কবিতা যেন কোথাও না কোথাও রবীন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দেয়। 'কাল যমুনা' কবিতার নারীর আর্তি সমকালীন প্রেক্ষিতে এসেছে এ কাব্যে। প্রতিবাদের পরতে পরতে শঙ্খ ঘোষের এভাবে জেগে ওঠা নানামাত্রিক ও একই সঙ্গে প্রবল মানবিক। ক্ষমতা বলয়ের কেন্দ্র বিরুদ্ধতা যেমন রয়েছে কবিতায় তেমন ব্যঙ্গ ও কৌতুক রয়েছে। পরিহাসময় মতবিরুদ্ধতাও রয়েছে তাঁর চেতনার অগ্নিগোলকে। তিনি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরী হয়েছেন নির্দ্বিধায়। অত্যাচার নিপীড়নের সত্য ছবি তুলে ধরার সচেষ্টতা যেমন তাঁর ছিল তেমনি সমাজের অবহেলার শিকার নানা স্তরের মানুষের কথাও তুলে ধরেছেন অকৃত্রিম স্বভাবে। তাই কবি বলেন-

"বেচিস না মা বেচিস না
বেচিস না আমায়

ওরাও ছিঁড়ে খাবে, না হয়
তুই আমাকে খা..." [৮]

শরীর বেচে খাওয়া সেইসব নারী যাদের সমাজ বেশ্যা বলে ঘৃণিত করে রেখেছে আজীবন। নিম্নবর্গের মধ্যেও নিম্নবর্গীয় সে সব নারীর কথনও কবির বাক্যে অকৃত্রিম দরদ নিয়ে জায়গা করে তুলে এনেছেন। রাস্তার ভিখিরি ছেলের অভিমানকেও তুলে ধরেন কবি তাঁর কবিতায়। পুঁজি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে প্রায় সব ধরণের শ্রেণী বিভক্ত সমাজই এসব সাব-অলটার্ন কিংবা নিম্নবর্গীয় শ্রেনী নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলছে – আগামীতেও চলবে। শঙ্খ ঘোষের প্রিয় ছাত্র ছিলেন তিমির বরণ সিংহ সে নকশাল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশমুক্তি স্বপ্ন দেখেছেন। একদিন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সে পুলিশ পিটিয়ে তাকে মেরে ফেলে। কবি হৃদয় কান্নায় আর্ত হয়। তাকে নিয়ে অনেকবারই কবিতায় সে অনুভব, ব্যথাতুর হৃদয়ের ভাবনা ব্যক্ত হয়। বনের পাখি আর খাঁচার পাখির প্রতীকে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন। শঙ্খ ঘোষ বহু জায়গায় 'পাখি', 'ডানা' এসব শব্দ প্রয়োগ করে কবিতা লিখেছেন। যদিও এসব প্রতীকের দ্বারা সমকালীন সংকটকে ইঙ্গিত করেছেন। কবির লেখা 'মার্চিং সং' কবিতাটি ও সমকালের ভয়কে ব্যক্ত করে সন্ত্রাস কথাটি কেউ বললেই তার সর্বনাশ ঘটবে এমন ইঙ্গিত দেন। গনমানুষের দাবি ও আর্তনাদ কবিকে মরমি করে তুলেছিল। তাই দেশ ভাগের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিপ্লবদেখা চোখে কবি দেখেন বহু দেশপ্রেমিকের জীবনাবসান। তাই তিনি কাব্যশক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষ গোচরে করিয়েছেন পাঠককেও বর্তমান সমাজের রূপ। মানুষের মস্তক তোলার যে সুযোগ ছিল না একটা সময়, সমাজ যে ভয়ার্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল সেটা তাঁর কবিতা পাঠ করলেই জানা যায়। 'রাধাচূড়া' সেরকমই কবিতা। রূপকের আড়ালে রয়েছে সত্যের খোঁজ। কবিতাটি তৎকালীন সরকার নিষিদ্ধও করেন। মালী কতৃক গাছপালা পরিচর্যার অন্তরালে স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র বজায় রাখার নগ্ন কৌশলকে উন্মোচন করেন –

"সবই বলেছিল ঠিক, শুধু
মালী যা বলেনি সেটা হলো
সেই বাড় নীচে চারিয়ে যায়
শিকড়ে শিকড়ে মাথা খোঁড়ে, আর
এখানে-ওখানে মাটি ফুঁড়ে
হয়ে ওঠে অন্য এক গাছ।" [৯]

কবি প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর শিল্পিত মনের অন্দরে রয়েছে অপার ক্ষমতা, যা দিয়ে সমাজকে দিশা দেখানো যায়। পুরাণ, মিথ, ইতিহাস, দর্শন সব ধ্যান-ধারণাকে সত্যরূপে গ্রহণ করেছেন। বিপদকালে অর্ধেক রেখে অর্ধের ছাড়ার মতো শিক্ষাকে কাজে লাগানোর কথা ভেবেছেন। মহাজনেরা যে পথ গ্রহণ করেন সে পথে চলার নির্দেশ ইঙ্গিত করেন। শান্তির আকাঙ্ক্ষা 'আপাতত শান্তিকল্যান' কবিতায় প্রতিবাদের এক বীভৎস রূপ দেখি। সত্যকে জমকালো রেখে স্বাধীনতা উদ্‌যাপনের মাঝেও শান্তি রাখেন। যন্ত্রের মতৈ ব্যবহার করে মানুষ মানুষকে যখন ক্ষমতার আধিক্য থাকে। সব তখন চুপ করে যায়। বোবার শত্রু নেই জেনে অন্যায় হয় অহরহ। তবু প্রতিবাদের ক্ষমতা শেষ হয় না। মানবতার জ্ঞানে যারা মানুষ ছুঁতে চায় না, তাদের বাবু বলেছেন কবি। ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন, দেশের নিরাপত্তা বিপন্নর অজুহাতে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জরুরি অবস্থা ঘোষণা হয়। চারিদিকে চাপা উত্তেজনা। কেউ পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। জানা গেছে প্রতিবাদ করলেই গ্রেফতার করা হবে। আবার কণ্ঠরোধ ! কবি ক্ষুব্ধ ক্ষমতাসীনদের ফ্যাসিস্ট আচরণে। প্রচারে নিষিদ্ধ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কোন গান। কে নিষিদ্ধ করছে ? আমরাই তো ! কবির কাছে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রত্যেক ঘটনাই তাঁর কবিতা সৃষ্টির মূলে থেকেছে। চারাগাছ টবে লাগানোর বিষয়ে আলোচনা থেকে যেমন জন্ম নেয় 'রাধাচূড়া' কবিতা। বৃক্ষকে যে টবে রাখা যায় না সেই ইঙ্গিতে সমাজকে শিক্ষা দিতে চান। রবীন্দ্রনাথের কথা মনে করেন কবি – জানিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড ও আরওয়ালের

গান্ধীমাঠের ঘটনা মিলেমিশে এক হয়ে যায়। ইতিহাসকে যে দেখতে পায় না সে তো অন্ধই। কবিও মনে করেন 'প্রবাহিত মনুষ্যত্ব' থেকে বড়ো কিছুই নয়। এ যুগের নচিকেতাকে চেনাতে চান কবি – তার দায়িত্বের কথা জানিয়ে দিতে চান কবিতায়, বলেন –

"দিয়ে যেতে হবে আজ এই দুই চোখ
ঘ্রাণ শ্রুতি স্পর্শ সব দিয়ে যেতে হবে।
উঠোনে দোপাটি হাওয়া স্মৃতি ও ডালিম
মাঠের পথিক শ্রান্তি দিগন্ত দুপুর
কিছু উজ্জীবন কিছু হাহাকার আর
দিয়ে যেতে হবে সব সেতুহীন দিন।" [১০]

শুধু সমসাময়িক ঘটনা বা প্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয় না কবিতা। অবচেতন মনেও কবিতা সুপ্তাবস্থায় থাকে। কবি নিজেই স্বীকার করেন রবীন্দ্রনাথ সর্বস্তরে সবসময়ই আগ্রহী থেকেছেন, তাঁর সেই প্রবণতার ইতিহাস কবিকে অনেকটা প্রেরণা দেয়। এ কাব্যের চিত্রকল্প হিসেবে 'প্রাচীন নিমগাছ' এসেছে বিশেষ বার্তাবহন করে। উন্মূলিত হয় সনাতন বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আর ছায়া স্নিগ্ধ, নিরাতপ আশ্বাস সবই শেষ বিকেলে ঝড়ে ছিন্নমূল হয়ে ভূমি শয্যা নেয়। ১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বোত্তর বিশ্বে মানবিক মূল্যবোধের অপচয় দেখে ইয়েটস্ তাঁর 'The Second Coming' কবিতায় বস্তু বিশ্বের ধ্বসে পড়া দেখেছিলেন বিহ্বলভাবে, তার সাথে মিলে যায় এসব যেন। যে অভিজ্ঞতা একেবারে ব্যক্তিগত, যে ভাষা শুধুই ব্যষ্টির তাঁর কবিতায় তা বারে বারে নৈর্ব্যক্তিক সামাজিক সত্যের 'Objective Co-relative' হয়ে ওঠে। শব্দ তখন আর নিরাশ্রয় কঙ্কালমাত্র থাকে না, উদ্দীপন বিভাবের মতোই চকিত নিঃসরণ ঘটায় অনির্বাচ্য উপলব্ধির। কবির কবিতা এমনই, একই সঙ্গে মন্দন গুনে ভাস্বর এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধে উদ্বেল। সত্য ও ন্যায়ের আলো যদি না আমাদের সরণি নির্মান করে আমরা কীভাবে গড়ে তুলব আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ? আমরাই যদি চিরাচরিত ব্যবস্থার সাথে সমঝোতা করি বা আপোস করি, নিজেদের ক্ষুদ্র ও দীর্ণ করি স্বার্থের গণ্ডিতে কবির কবিতার পংক্তিগুলি সেই সব যা মুহূর্তে আমাদের কাছে সকালবেলার রোদের মতো নবীন দিনের বার্তা নিয়ে আসে। সেই বার্তা নিজেক নতুন করে আবিষ্কার করার মহৎ ভাবনায় সর্বাংশে প্রাণিত করে। কবির কবিতায় শব্দ নির্মানের এক অত্যাশ্চর্য ভঙ্গিমা লক্ষ্য করতে পারি যা অন্য কোন ভুবনের গানকে প্রকাশ করে। সমাজের যাবতীয় ত্রুটিকে তিনি বোধের দ্বারা দেখেছেন। তার থেকে উত্তরণের পথ খুঁজেছেন এবং মানুষের আদর্শ গড়ে তোলার কারিগর হিসেবে তাঁর অগণিত সৃষ্টিসম্ভার রেখেছেন। দশকের পর দশক মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জীবন্ত দলিল তাঁর সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের মতোই সুদূরপ্রসারী ভাবনার বীজ বপনে সক্ষম তাঁর সৃষ্টি।

Reference:

১. ঘোষ শঙ্খ, মাঘ ১৪২৭, শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ – ১,'যমুনাবতী', দিনগুলি রাতগুলি, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং,পৃ- ৫৮।
২. ঐ, পৃ- ৪২।
৩. ঐ, পৃ- ৩০৩।
৪. ঐ, পৃ- ৩০৯।
৫. ঐ, পৃ- ৩১৭।

৬. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ,মাঘ ১৩৯৪, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, 'বলাকা', কলিকাতা ১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃ-১৯
৭. ঘোষ শঙ্খ, মাঘ ১৪২৭, শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ –১,'যমুনাবতী', দিনগুলি রাতগুলি, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ- ৩২৫।
৮. ঐ, পৃ- ৩৩৭।
৯. ঐ, পৃ- ৩৪১।
১০. ঐ, পৃ- ৩৫০।